দাম ২ টাকা

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৫, সংখ্যা: ১২ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | মার্চ ২০১৫

নতুন নতুন ভাইরাসরা সব ধেয়ে আসছে

আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নতুন ভাইরাসের সম্মুখীন হচ্ছে মানুষ, বলছেন বিজ্ঞানীরা

‘ইবোলা’ নামটা শুনলেই আফ্রিকার মানুষ এখন আতঙ্কিত হন। হওয়ারই কথা। ওই ভাইরাস আফ্রিকার কয়েকটি দেশে কয়েক মাস ধরে যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালিয়েছিল, তার ফলে বহু মানুষ মারা গেছেন, ধ্বংস হয়েছে অনেক পরিবার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কা-লিঙ্কন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ড্যানিয়েল ব্রুকস বলেছেন ইবোলা ভাইরাস-এর এই আক্রমনে অনেকটাই ইন্ধন জুগিয়েছে আবহাওয়া পরিবর্তন।

এখন আবার ভারতে সোয়াইন-ফ্লু ছড়াচ্ছে নানা জায়গায়। সেই সঙ্গে বাড়ছে ভয়। কিছু কিছু রাজ্যে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সোয়াইন মানে শূয়োর। জানা গেছে তাদের থেকে ঘটছে ওই সংক্রমণ। তাই নাম সোয়াইন-ফ্লু। আগে ওই ভাইরাস শূয়োরদের আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হত। এখন মানুষের দিকেও প্রবল বিক্রমে ধেয়ে আসছে।

মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে ব্রুকস বলেছেন আগামী দিনে আরও অনেক ধরনের নতুন ভাইরাসের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেবে। উনি বলেছেন

মহাকাশচারী নয়, ইবোলা আক্রান্তদের উদ্ধারকাজে চলেছেন স্বাস্থকর্মীরা

আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতিতে নানা ওলোট-পালট ঘটে যাচ্ছে। মানুষ জীবজন্তু, পোকামাকড় সকলেরই বাসস্থান, জীবনযাত্রা বদলে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে নতুন নতুন জীবাণুর মুখোমুখি পড়ে যাচ্ছে তারা। ব্রুকস বলেছেন এক এক জায়গায় এক এক ধরনের নতুন জীবাণুর সম্মুখীন হবে মানুষ। আর তাদের ঠেকাতে হিমসিম খাবেন চিকিৎসকরা আর চিকিৎসার খরচও বাড়বে বিপুল।

ব্রুকস গবেষণা চালিয়েছেন তাঁর সহকর্মী প্রাণীবিজ্ঞানী এরিক হোবার্গ-এর সঙ্গে। ব্রুকস নিজে কাজ করেছেন গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে আর হোবার্গ তাঁর অনুসন্ধান চালিয়েছেন উত্তরমেরুতে। তাঁরা লক্ষ করেছেন আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে গরম আর ঠান্ডা দুই এলাকাতেই নতুন নতুন প্রাণী চলে আসছে তাদের পুরনো বাসস্থান ত্যাগ করে। আর সেই সঙ্গে তারা পড়ে যাচ্ছে এক রাশ অচেনা জীবাণু আর ভাইরাসের মুখে যাদের সঙ্গে লড়াই করার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই তাদের শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধবাহিনীর।

অন্যদিকে পরিস্থিতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে জীবাণু আর ভাইরাসরাও বেরিয়ে পড়েছে নতুনের সন্ধানে। যেমন, দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কোস্টারিকায় নির্বিচারে শিকার করার ফলে সেখান থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে কাপুচিনো আর স্পাইডার বাঁদর। ফলে তাদের শরীরে যে সব অসুখবাহী জীবাণু বাসা বাঁধত, তারা এখন হাউলার বাঁদরদের নিশানা করেছে। আর কানাডার মেরু অঞ্চলে এক প্রজাতির কেঁচো, যারা ক্যারিবু নামক এক ধরনের বড়সড় হরিণ জাতীয় প্রাণীর ফুসফুস আক্রমণ করত, তারা এখন মাস্কঅক্সেন নামের বাইসনের মত দেখতে প্রাণীদেরও বেছে নিচ্ছে।

বিগত একশ’ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা মনে করে আসছিলেন যে এক এক ধরনের জীবাণু ও ভাইরাস তাদের নির্দিষ্ট কিছু বাছাই করা প্রাণীদেরই আক্রমণ করে। কিন্তু সেই ধারণা এখন ভাঙতে বসেছে। দেখা যাচ্ছে যে সব ভাইরাস এত কাল নিজেদের বাঁদর, শূয়োর, পাখির মধ্যে আটকে রাখত, এখন তারা মানুষকেও ছেড়ে কথা বলছে না। এতে মানুষের বিপদ বাড়ছে, কারণ তাদের বিরুদ্ধে কী ভাবে লড়তে হবে তা আমাদের শরীরের সৈনিক কোষেদের জানা নেই। নেই তাদের বিরুদ্ধে সঠিক কাজ করবে তেমন উপযোগী ওষুধও। **সূত্রঃ ইউনিভারসিটি অফ নেব্রাস্কা-লিঙ্কন,**

Philosophical Transactions of Royal Society B special issue on climate change and vector-driven disease in humans

---

জানা অজানা

মস্তিষ্ক নেই, তাও মনে রাখে

সে এক অদ্ভুৎ ব্যাপার। মগজ নেই, কিন্তু বুদ্ধি আছে! ব্যাক্টেরিয়া বা জীবাণু, যারা আমাদের ভালও করে মন্দও করে, তারা এক কোষের প্রাণী। এক কোষের প্রাণী, তাই তাদের ওই ক্ষুদ্র শরীরে আলাদা করে মস্তিষ্কের আর জায়গা হয় নি। তা সত্ত্বেও তারা অনেক কিছু মনে রাখে, বিশেষ করে ভারইরাসদের আক্রমণের কথা।

ভাইরাস মানুষ সহ প্রায় সব প্রাণীকেই আক্রমণ করে থাকে। তাদের হাত থেকে বাদ যায় না জীবাণু বা ব্যাক্টেরিয়ারাও। ফলে মারমুখী ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হলে তারাও অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু একবার সেরে উঠলে তারা ভোলে না সেই আক্রমণের অভিজ্ঞতা। আর সেই বিশেষ ভাইরাসের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে দুর্মর প্রতিরোধ ব্যবস্থা। অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না, অথচ নিজেদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে তারা এক জটিল প্রক্রিয়ার সাহায্য নেয়। ভাইরাসের দেহ থেকে ডিএনএ-এর কিছু প্রয়োজনীয় নমুনা তুলে নিয়ে তারা সঞ্চিত করে রাখে নিজেদের শরীরে। আর সেই অনুযায়ী তৈরি করে নিজেদের প্রতিরক্ষা। আবারও যদি কোনও দিন সেই ভাইরাসের দল অতর্কিতে আক্রমণ চালায়, তখন তাদের চট করে চিনে ফেলে জীবাণুর নিজস্ব রক্ষীরা। শুরু হয় যুদ্ধ।

এবার ৩ পাতায়

বিশ্বের সর্বোচ্চ জাতীয় উদ্যান নেপালে

জাতীয় উদ্যান * সাগরমাথা

পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ যে জাতীয় উদ্যানকে আলোকিত করে দাঁড়িয়ে আছে তার নামেই 'সাগরমাথা জাতীয় উদ্যান'। হ্যাঁ, নেপালি ভাষাতে এভারেস্টকে ওই নামেই ডাকা হয়। পূর্ব নেপালে সলুখুম্বু জেলায় প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত এই উদ্যানে এভারেস্ট ছাড়া আরও সাতটি শৃঙ্গ আকাশ ছুঁয়ে আছে। আছে আরও অসংখ্য শৈলরাজি, অগুন্তি হিমবাহ, গভীর উপত্যকা আর অসাধারণ সব বিরল প্রজাতির প্রাণী। শুধু তাই নয়, তাদের সঙ্গেই এই উদ্যানে কয়েক হাজার শেরপার বসবাস। তাদের অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে গত ৪০০ বছর ধরে অন্তত ২০ টি গ্রামে বাস করছে তারা। সাধে কি ইউনেস্কোর ঐতিহ্য স্থলের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে এই সাগরমাথা জাতীয় উদ্যান?

এই উদ্যানের জন্ম ১৯৭৬ সালে ১৯ জুলাই। পৃথিবীর সব থেকে উঁচুতে এই জাতীয় উদ্যান সাগরমাথা, ৯৮৪২ থেকে ৩১৮২৪ ফিট পর্যন্ত উচ্চতায় বিস্তৃত। এই উদ্যানই ১৯৭৯ সালে ভারতের প্রথম বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্য স্থল হিসেবে চিহ্নিত হয়। তবে এই অঞ্চলে পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল সেই ১৯৬০ সাল থেকেই। কিছুটা দুর্গমতা, অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সর্বোপরি মাউন্ট এভারেস্টের আকর্ষণে প্রতি বছরই বিপুল বিদেশি পর্যটকদের সমাগম হয় সেখানে। যেমন গত বছরই ৩৭ হাজারেরও বেশি শুধু বিদেশি পর্যটকই এই উদ্যান পরিদর্শন করেন।

এক তো বিপুল উচ্চতা, দ্বিতীয়ত প্রাণী বৈচিত্রেও সে অনন্য সাধারণ। তুষার চিতা, রেড পান্ডা, বুনো চমরি গাই, কস্তুরি মৃগ, হিমালয়ের কালো ভালুক'র মত বিরল ও বিপন্ন সব প্রাণীর আবাসস্থল। প্রায় ১১৮ রকমের পাখি দেখা যায় সেখানে। আর নানান উচ্চতায় পাইন, হেমলক, বার্চ, রোডোডেনড্রন, সিলভার ফার, জুনিপার, বাঁশ ইত্যাদি গাছেদের সমাবেশ। অবশ্য এই উদ্যানের ৬৯ শতাংশই গাছপালাহীন রুক্ষ প্রান্তর। কারণ বেশি উঁচুতে তো গাছপালা জন্মায়ই না। তবে ২৮ শতাংশ রয়েছে চারণভূমি এবং মাত্রই ৩ শতাংশ তার অরণ্যাঞ্চল। আর এই প্রত্যন্ত বৈচিত্রপূর্ণ ও কঠীন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়েই শেরপা জন গোষ্ঠীর বসবাস। যাদের ছাড়া এভারেস্টই হোক বা হিমালয়ের অন্যান্য শৃঙ্গ অভিযানই হোক - এই শেরপাদের সাহায্য ছাড়া এক কথায় তা অসম্ভব। ওই প্রকৃতি, বন্যপ্রাণী ও শেরপা-- - পারস্পরিক সহাবস্থানই তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। আকাশ পথে কিম্বা স্থলপথে যেভাবেই যাওয়া হোক না কেন জাতীয় উদ্যানে পৌঁছতে কিন্তু কোথাও ২ দিন কোথাও বা দশদিন ধরে ট্রেক করতে বা হাঁটতে হয়। তবে নিশ্চিত সেই ভ্রমণ, পদে পদেই রোমাঞ্চকরে হয়ে ওঠে পর্যটকদের কাছে।

সূত্রঃ নেপাল. সার্কটুরিজম.অরজ, whc.unesco.org

আঙ্গুল বলে দেয় চরিত্রের গুণ

আঙ্গুল দেখে কি বোঝা যায় লোকটার স্বভাব কেমন? যায়। কয়েক দিন আগে এক গবেষণা পত্রে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পুরুষদের হাতের দুই আর চার নম্বর আঙ্গুলের মধ্যে দৈর্ঘ্যের তফাৎ ইঙ্গিত দেয় মানুষটি কেমন, বিশেষ করে মহিলাদের প্রতি তার আচরণ কেমন হতে পারে। সাধারণত হাতের দু নম্বর আঙ্গুলের চেয়ে চার নম্বর আঙ্গুল লম্বায় বড় হয়। আর তাদের মধ্যে লম্বার তফাৎটাই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে দেয়। চার জন বিজ্ঞানী – ডি.এস মস্কোউইটস, র‍্যাচেল সাটন, ডেভিড জুরফ আর সাইমন ইয়ঙ্গ – বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ওই

দুই আঙ্গুলের মাপের তফাৎটা দেখিয়ে দেয় এক বিশেষ হরমোন – অ্যান্ড্রেজেন – মানুষটির ওপর কতটা প্রভাব খাটিয়েছে। তফাৎ যত কম, অ্যান্ড্রোজেনের প্রভাব তত বেশি। আর সেই প্রভাব যত বেশি, মহিলাদের প্রতি ব্যক্তিটি ততই বেশি সংবেদনশীল।

সূত্রঃ ম্যকগিল প্রেস বিজ্ঞপ্তি ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

চিতাবাঘের সঙ্গে ওঠা বসা মুম্বাইয়ে

চিতাবাঘের সঙ্গে থাকতে হবে, বা থাকতে শিখতে হবে। তেমনই দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা মুম্বই শহরের এক প্রান্তে, যার সঙ্গে লেগে আছে সঞ্জয় গান্ধী ন্যাশনাল পার্ক। ওই পার্ক থেকে মাঝে মাঝেই চিতাবাঘ বা লেপার্ড চলে আসছে জনবসতিতে। কয়েকটি অঘটনও ঘটে গেছে সাম্প্রতিক কালে। আর তার ফলে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সেখানকার বাসিন্দারা।

কিন্তু তার জন্য চিতাবাঘের বিশেষ দোষ দেখছেন না প্রাণী বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন যে মানুষের বসতি এমন ভাবে ঘিরে রেখেছে **(ছবি)** চিতাবাঘেদের ওই আস্তানাটিকে যে প্রাণীগুলি একটু হাত-পা ছেড়ে বিচরণ করতে গেলেই তারা গিয়ে পড়ছে সেখানে।

তাছাড়া বসতিগুলিতে পালন করা হচ্ছে মুরগি, ছাগল, শুয়োর, যা কিনা লেপার্ডদের খুব সহজলভ্য লোভনীয় শিকার। পাশেই মানুষের বস্তিতে যখন মজুত আছে পর্যাপ্ত খাবার, তখন অহেতুক বনেবাদাড়ে অনেক কসরত করে চারটে খরগোস বা হরিণের পেছনে প্রাণপাত করে ছুটে বেড়ান বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তারা সূর্য ডুবলে নিঃশব্দে চলে আসছে মনুষ্য বসতিতে। ওৎ পেতে বসে থাকছে, আর সুযোগ বুঝে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তাদের খাবার।

সূত্রঃ ডাউন টু আর্থ

অ্যালবাট্রস

ডানা মেললে তার দৈর্ঘ্য ছাড়িয়ে যায় ১১ ফিটেরও বেশি। ওই বিশাল ডানাই সাগরের দুরন্ত হাওয়া কেটে ঘন্টার পর ঘন্টা না থেমে উড়ে যেতে সাহায্য করে এই সমুদ্র পাখি অ্যালবাট্রসকে। প্রধানত মাছই তাদের খাদ্য, আর নোনা জল। প্রায় ৫০ বছর পরমায়ু নিয়ে কেবলই উড়ে চলা এই পাখিরা ডাঙায় ফেরে কেবল প্রজননের জন্য। তখন তারা কোনও প্রত্যন্ত দ্বীপে কলোনি গড়ে তোলে। একটি করেই ডিম পাড়ে তারা। জন্মের তিন থেকে দশ মাসের মধ্যে উড়তে শেখে বাচ্চারা। তারাও ডাঙা ছেড়ে উড়ে যায়। পাঁচ-দশ বছর পরে তারা ফিরে আসে প্রথম, সন্তানের জন্ম দিতে।

মস্তিষ্ক নেই

১ পাতা থেকে

জীবাণুদের নির্ভুল প্রতিআক্রমণে এক এক করে এলিয়ে পড়ে ভাইরাস বাহিনীর সৈন্যরা। লড়াই শেষে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে জীবাণুরা। শান্তি ফেরে।

জীবাণুদের আত্মরক্ষার এই জটিল পন্থার কথা জানা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ইউনিভারসিটির গবেষণা থেকে। বিজ্ঞানী লুসিয়ানো মুর্‌রাফ্‌ফানি বলেছেন ভাইরাসের ডিএনএ তুলে নেওয়াটাই জীবাণুদের পক্ষে বিরাট কৃতিত্বের কাজ। সেটা তারা করে ক্যাস-৯ নামক এক এনজাইমের সাহায্যে। কিন্তু কী করে তারা এটা করে তা এখনও জানা যায় নি।

সূত্রঃ সায়েন্স ডেইলি

বাঁদর পুনর্বাসন, নতুন বিভ্রাট

দিল্লিতে বাঁদরের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছিল, সেই সঙ্গে তাদের সমবেত বজ্জাতি। রাজধানীর অভিজাত পাড়াগুলিতে বাঁদরের বাঁদরামি মোটেই আর বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না সেখানকার প্রভাবশালী বাসিন্দারা। বাঁদরের হাত থেকে বাঁচার পথ খুঁজতে তাঁরা গেলেন আদালতে – দিল্লি হাইকোর্টে। সব দিক বিচার করে কোর্ট বললেন বাঁদর দূর কর। কিন্তু কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলা হবে ট্রাক বোঝাই কয়েক হাজার বাঁদর। দিল্লির উপকণ্ঠে একটা জায়গা বাছা হল। সেটির নাম সঞ্জয় নগর। তার পাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রচুর গাছপালা আছে। এমন কি ছোটখাটো জঙ্গলও বলা

চলে সেটিকে। চালচুলোহীন বাঁদরদের পুনর্বাসন হল সেখানে।

কিন্তু এখন সঞ্জয় নগরের বাসিন্দাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। বাঁদর ব্যাটিলিয়ন এখন দলে দলে তাঁদের বাড়িতে রোজ হানা দিচ্ছে খাবারের সন্ধানে। তাড়াতে গেলে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসছে। কিন্তু পাশেই জঙ্গল থাকতে তারা বসতিতে খাবার খুঁজতে আসছে কেন?

কারণ, তাদের যে বনে ছাড়া হয়েছে সেখানে ফলের গাছ নেই।

সূত্রঃ ডাউন টু আর্থ

আর নয়

মেঘালয় সরকার বলছে তাঁরা আর ওই রাজ্যে চাষবাসে কীটনাশক ব্যবহার করবেন না। মেঘালয়ে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে প্রতিবছর অনেক মানুষ বিষক্রিয়ার শিকার হচ্ছেন। তাই ওই ব্যবস্থা নিচ্ছে সেখানকার সরকার। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মাটি ভাল করতে জৈবসার তৈরির উদ্যোগও নিচ্ছে সরকার।

পরিষেবা

দেখে নাও

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ওখানে বাজারের সব ফল-সব্জি বিভাগীয় আধিকারিকদের ভালো করে পরীক্ষা করিয়ে নিতে বলেছেন। কেরলে ফল-সব্জিতে খুব কীটনাশক মেশান হচ্ছে। **পরিষেবা**

দেশে দেশে অনাহার, তবু জমি ভরাট হয় শস্য দিয়ে

জেনে রাখা ভাল

প্রতি বছর বিপুল পরিমান খাদ্য উৎপাদন হলেও বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি দিন না খেয়ে বা পেটে খিদে নিয়েই রাতে ঘুমোতে যায়। কারণ উৎপাদন প্রচুর হলেও খাদ্যের অপচয়ও বিপুল। যেমন দেখা যাচ্ছে -

- বিশ্বে মানুষের জন্য উৎপাদিত খাদ্যের এক তৃতীয়াংশই যা প্রায় ১০০ কোটি ৩০ লক্ষ, প্রতি বছর নষ্ট হয়।
- প্রতি বছর ধনী দেশগুলিতে প্রায় ২২ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য নষ্ট হয়।
- খাদ্য শস্যের ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টন বর্জ্য হিসেবে জমি ভরাটের কাজে লাগে প্রতি বছর।
- এই অপচয় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় দেখা যাচ্ছে মাথা পিছু ৯৫-১১৫ কেজি। আর আফ্রিকায় সাহারার নিম্ন অঞ্চল এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মাথাপিছু খাদ্য অপচয়ের পরিমান বছরে ৬-১১ কেজি।
- উন্নয়নশীল দেশে ফসল কাটা ও তা তৈরির সময়ই ৪০% নষ্ট হয়ে যায়। আর শিল্পোন্নত দেশে ৪০% অপচয় হয় সরবরাহ ও খাদ্য শস্য ব্যবহারের সময়।
- যদি বর্তমানে নষ্ট হওয়া খাদ্য শস্যের এক চতুর্থাংশও বাঁচানো যেত তাহলে পৃথিবীর ৮৭ কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে যথেষ্ট পরিমানে খাদ্য শস্য পৌঁছনো যেত।

সূত্রঃ থিঙ্কইটসেভ.অরজ

হিমবাহ

দেশের চার বিশ্ববিদ্যালয় মিলে চার রাজ্যের হিমবাহ নিয়ে গবেষণা করবে। তারা একটি কমিটি করেছে। এ জন্য কাজ করবে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় ও সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়। যে যে অঞ্চলে হিমবাহের ওপর কাজ হবে সেগুলো হল কাশ্মীর, কারাকোরাম, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম ও উত্তরাখন্ড। হিমবাহ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কাজ এই প্রথম।

পরিষেবা

চিনে জল

চিন দেশে জলের বড় টানাটানি হয়েছে। কারণ চিনে জল দূষিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে বিশুদ্ধ পানীয় জল চিন সরকার সবাইকে দিতে পারছে না। চিনে ২০১৩-র মধ্যে জল সরবরাহের ১০ কেন্দ্রের ৫০ শতাংশ জল দূষিত হয়ে গেছে। আবার ৩১ মিষ্টি জলের হ্রদের ১৭ দূষিত হয়েছে। ওখানে মাটির নীচে জলের ৪৭৭৮ জায়গায় জল খারাপ বা খুব খারাপ। খবরটি দিয়েছে জিনহুয়া নিউজ এজেন্সি।

পরিষেবা

প্লাস্টিকের ইট দিয়ে তৈরি হবে বাড়ি

প্লাস্টিক দেখেন নি বা ব্যবহার করেন নি এমন এক জনও পাবেন না আপনার চেনাজানা লোকের মধ্যে। এখন সব বাড়িতেই প্লাস্টিকের ব্যবহার - থালা ঘটি বাটি গেলাস মগ বালতি বোতল ইত্যাদির কথা বাদ দিন, থলির কথাই ধরুন। প্লাস্টিকের থলিতে আপনার ঘর দেখুন ভরে আছে। বাজারে যা-ই কিনতে যান, প্লাস্টিকের থলি।

পাতলা প্লাস্টিকের থলি অনেক দিন আগেই নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মানছে কে, মানানোর চেস্টা করছে কে?

রাস্তাঘাট পুকুর ডোবা নদী নালা যে দিকে তাকাবেন, পাতলা প্লাস্টিকের থলি দেখবেন আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। এমনকী, দূর সমুদ্রও বাদ নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রে এখন কত প্লাস্টিক ভাসছে জানেন? পাঁচ ট্রিলিয়ন খন্ডেরও বেশি। ট্রিলিয়ন, বাংলা করে বললে বোধহয় সুবিধা হবে – এক ট্রিলিয়ন হল এক লক্ষ কোটি, অঙ্কে লিখলে ১,০০০,০০০,০০০,০০০। তার মানে, পৃথিবীর সমুদ্রে এখন পাঁচ লক্ষ কোটি খন্ডেরও বেশি প্লাস্টিক ভাসছে। এই এত প্লাস্টিকের ওজন হবে প্রায় দু লক্ষ সত্তর হাজার টন।

প্লাস্টিকের ইট

প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে সারা পৃথিবীতেই চিন্তা দেখা দিয়েছে। তার কারণ, প্লাস্টিক পচে না, গলে না, মাটিতে মিশে যায় না – তার আয়ু যেন কচ্ছপের আয়ু। প্লাস্টিক যত দিন বাঁচে, মানুষের বিপদ সৃষ্টি করে। শুধু মানুষের নয়, জীবজন্তুরও।

রাস্তার ধারে বা আস্তাকুঁড়ে পাতলা প্লাস্টিক খেয়ে কত গরু মারা গিয়েছে, সংখ্যা মনে করতে না পারলেও কাগজে খবর পড়েছেন নিশ্চয়। আবার, পাতলা প্লাস্টিক শহরের নালা বুজে জলনিকাশ আটকে দিয়ে বিপত্তি সৃষ্টি করেছে তা-ও কাগজে পড়েছেন।

মোটা প্লাস্টিক রিসাইক্ল করা যায়, মানে রাসায়নিক ভাবে পরিবর্তন ঘটিয়ে আবার ব্যবহার করা যায়, পাতলা প্লাস্টিক যায় না। তাই পাতলা প্লাস্টিক নিয়েই চিন্তা বেশি। পাতলা প্লাস্টিক রিসাইক্ল করা না গেলেও এখন অন্য ভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে। ডেনমার্কে ফেলে-দেওয়া প্লাস্টিক দিয়ে এমন ইট তৈরি করা হচ্ছে যা অনেক কাজে ব্যবহার করা যায়। সেখানে চুল্লিতে ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্লাস্টিক গলিয়ে তা দিয়ে ইট তৈরি করা হচ্ছে।

ডেনমার্কের মত পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনেও এখন ফেলে-দেওয়া প্লাস্টিক থেকে ইট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সুন্দরবনে বিদ্যুতের চুল্লি বা কয়লার চুল্লি নেই, সৌরশক্তি দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। সুন্দরবনের লোকেরা যত্রতত্র ফেলে-দেওয়া প্লাস্টিক কুড়িয়ে জড়ো করছে, তারপর তা ইট তৈরির জায়গায় নিয়ে গিয়ে ইট তৈরির জন্য জমা দিচ্ছে। এই ইট রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করা যাবে, বাঁধের ভিত তৈরির কাজে ব্যবহার করা যাবে, বাড়ি তৈরির কাজেও ব্যবহার করা যাবে।

ডঃ রমেন মজুমদার; সৌজন্যঃ জীবন-কথা

পৃথিবীর বৃহত্তম রূপোর পাত্র আছে জয়পুরের প্রাসাদে

নাম তার গঙ্গাজলি। রাজস্থানের জয়পুরে মিস্ত্রি খানায় গোবিন্দরাম ও মাধব নামে দুই রৌপ্যকারের হাতে ১৮৯৬ সালে তার জন্ম। ভূমিষ্ঠ হতে তার অবশ্য সময় লেগেছিল প্রায় দু' বছর। আর হবে নাই বা কেন? আকৃতিতে তো পৃথিবীর বৃহত্তম রূপোর পাত্র বা জার'র সম্মান নিয়ে সে নাম লিখিয়েছে গিনেস বুক অফ রেকর্ডস এ। জয়পুরের রাজ পরিবারের বাসস্থান সিটি প্যালেসের যে অংশ মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে, সেখানেই তাদের ঝকঝকে উপস্থিতি প্রতিদিন সমস্ত পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মনে করা হয় ১৪০০০ ঝর শাহি (জয়পুর মুদ্রা), রূপোর মুদ্রা দিয়ে তৈরি হয়েছিল এক একটি জার বা জালা। রূপোর মুদ্রাগুলি গলিয়ে কাঠের ছাঁচে ফেলে বানানো হয়। লেগে যায় দুটি বছর। এই ৫ ফিট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার এক

একটি জালার ওজন প্রায় ৩৪৫ কেজি। তার বেড় ১৪ ফিট ১০ ইঞ্চি। আর এই বিশাল জালায় জল ধরে কত? তা নয় নয় করেও প্রায় ৪০৯১ লিটার।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি জয়পুরে সিটি প্যালেসের মিউজিয়াম ঘুরে দেখতে দেখতে দিওয়ান-ই-খাস এর মুক্ত হলে পৌঁছে দু'দিকে দুটি ওই বৃহদাকার রূপোর জালা দেখে প্রায় চমকে উঠলাম। মনে হল এই বিশাল জালা কি কারণে রাজা রাজড়ারা তৈরি করিয়েছিলেন? শুধুই খেয়াল না কি কোনও বিশেষ প্রয়োজনে? কৌতূহল নিরসন হল জালার পাশে তার সম্পর্কিত ছোট্ট লেখায় চোখ রেখে। ১৯০২ সালে জয়পুরের মহারাজা সোয়াই মাধো সিং-২ ইংলন্ডে গিয়েছিলেন সপ্তম এডওয়ার্ড'র অভিষেক উৎসবে যোগ দিতে। এবং সেই যাত্রায় তিনি বিদেশিদের জল পান করবেন না বলে ওই জালায় 'পবিত্র গঙ্গা জল' ভোরে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন অবশ্য দূষণ ভারাক্রান্ত গঙ্গা জল সরাসরি পানের কথা হয়ত স্বপ্নেও কেউ ভাববেন না। কিন্তু একটা সময় ছিলই যখন এই নদীর জলই পবিত্র জ্ঞানে শুধু পূজায় নয়, পানের জন্যও ব্যবহার হত। তাই দীর্ঘ বিদেশ যাত্রায় তেষ্টা মেটাতে মহারাজার জন্য ওই দৈত্যাকার জলপাত্র যে প্রয়োজন হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

মালবী গুপ্ত

সাদা গন্ডার বেড়েছে, কিন্তু বিপদ কাটে নি

সাদা বাঘের কথা তো প্রায় সবাই জানি, কিন্তু সাদা গন্ডার? নাহ, বোধহয় অনেকেই জানি না। স্থলভূমির দ্বিতীয় বৃহত্তম স্তন্যপায়ী বলে চিহ্নিত এই সাদা গন্ডাররা এক সময়ে প্রচুর ছিল। তারপর কমতে কমতে বিপন্নের তালিকায় প্রায় নাম লিখিয়ে ফেলেছিল আর কি। তবে নানা চেষ্টায় তাদের সংখ্যা বেড়েছে বটে কিন্তু একেবারে বিপদমুক্ত নয়। তাদের ঘিরে হুমকির ভ্রুকুটি এখনও বর্তমান।

আফ্রিকা মহাদেশের এই প্রাণীর প্রায় ৯৮ শতাংশেরও বেশি বাস করে দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, জিম্বাবয়ে ও কেনিয়ায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তো মনে করা হয়েছিল দক্ষিণের সাদা গন্ডাররা বুঝি বিলুপ্তই হয়ে গেছে। পরে ১৮৯৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্বাজুলু-নাটাল'এ শ'খানেকেরও কম সাদা গন্ডারের খোঁজ পাওয়া যায়। তারপর প্রায় একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের সুরক্ষা ও নানা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তারা সংখ্যা বেড়েছে। সংরক্ষিত এলাকায় এবং কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় তাদের সংখ্যা এখন সব মিলিয়ে ২০ হাজার মত। তবে সংরক্ষিত জায়গায় তারা সুরক্ষিত থাকলেও বন্য পরিবেশে শিকারের খাঁড়া তাদের মাথার ওপর সব সময়ই ঝুলছে। এবং বন জঙ্গলে তারা আছে মাত্র ১১ হাজারের মত।

সাধারণত আফ্রিকার তৃণভূমি অঞ্চলই তাদের বিচরণক্ষেত্র। লম্বায় তারা ১১ ফিট থেকে প্রায় ১৪ ফিটের কাছাকাছি হয় এবং ওজন ১৪৪০ থেকে ৩৬০০ কেজি পর্যন্ত। হাতির মত তারাও শাকাহারি অর্থাৎ ঘাসপাতা খেয়েই বাঁচে। এই গন্ডাররা খুবই সমাজবদ্ধ প্রাণী। একসঙ্গে ১৩/১৪ জন দল বেঁধে থাকে। মায়েরা সব সময় ছানাদের সঙ্গে করে ঘোরে। আর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ গন্ডার এলাকা পাহারা দেয়। সাধারণত আড়াই থেকে পাঁচ বছর অন্তর একটি ছানার জন্ম দেয় মা গন্ডার। তবে বছর তিনেকের আগে ছানারা মোটেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে না।

বিপন্ন যারা

তাদের শ্রবণ শক্তি ও ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর। নাকের ওপর দুটো খড়্গ থাকে যার একটি ৫ ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। মায়েরা ওই খড়্গ ব্যবহার করে সন্তানদের বিপদ থেকে আগলে রাখতে। আর পুরুষরা অবশ্যই তাকে কাজে লাগায় আক্রমণকারীর সঙ্গে লড়াইয়ের সময়। আবার এই খড়্গ তাদের জীবনে কালও বটে। কারণ চিন, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশগুলিতে সনাতনী ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয় ওই খড়্গ বা শিং। তাই নিষিদ্ধ হলেও চোরা শিকারিদের হাত থেকে তাদের নিস্তার নেই। এর পাশাপাশি চাষাবাদ ও বসতি গড়ে ওঠার জন্য এই গন্ডারদের বাসস্থান ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ায় তাদের জীবন কিছুটা হুমকির মুখে।

তবে সাদা গন্ডার সংরক্ষণের উদ্যোগ বেশ সফল হয়েছে। এবং এতে সংরক্ষিত অঞ্চলে শুধু গন্ডারই বাঁচছে না, সঙ্গে অমূল্য সব গাছপালা, বন্যপ্রাণীরাও বাঁচার সুযোগ পাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড নানা উদ্যোগ নিয়েছে। দেখা যাক ভবিষ্যতে তারা হুমকির তালিকা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে কিনা।

সূত্রঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, ডবলিউ.ডবলিউ.এফ

অসুখ হয় মৌমাছিদের, ওষুধ আসে মধু থেকে

মৌমাছিদেরও অসুখ করে। পেট খারাপ হয়। সারাদিন বনবন করে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ালে তো এমনটা হবেই! কিন্তু তাই বলে তো আর বাসায় বসে থাকা যায় না। খেটে খেতে হয় তাদের। বিশ্রামের অবকাশ কম। তাই পেট খারাপের ওষুধও আছে। তাদের মত করে দু চামচ খেয়ে নিলেই, আবার শরীর চাঙ্গা। ফের মধু আহরণে বেরিয়ে পড়া।

আর সেই মহামূল্যবান ওষুধ আসে ফুলের মধু থেকে। আক্রমণকারী পোকাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে গাছেরা নিজেদের শরীরে বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে যা হানিকর জীবাণু ও পোকাদের কাবু করে ফেলে। কিন্তু সেই সূক্ষ্ম হাল্কা বিষ মধুর সঙ্গেও মিশে থাকে। আর সেই মধু খেয়েই মৌমাছিরা তাদের শরীরে বাসা-বাঁধা শত্রু জীবাণুদের নির্মূল করে।

মৌমাছিদের এই ডাক্তারির কথা বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স ইউনিভারসিটি অ্যামহার্স্ট-এর গবেষক লিন অ্যালডার। মৌমাছিদের ওষুধ-জ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে অ্যালডার ভূরিভূরি প্রশংসা করেন গাছেদের। বলেছেন তাদের মত দক্ষ কেমিস্ট বা রসায়নবিদ আর হয় না। "আক্রান্ত হলে গাছেরা অন্য প্রাণীদের মত দৌড়ে পালাতে পারে না। তাদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তাই আত্মরক্ষার জন্য তারা নিজেদের শরীরে নানা রাসায়নিক পদ্ধতিতে অনেক ধরনের টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে যা তাদের পরজীবী, জীবাণু বা বড় প্রাণীর হাত থেকেও বাঁচায়।" এমনকী মানুষ যে রোগ তাড়াতে হাজারও রকমের ওষুধ ব্যবহার করে তার অনেকটাই তো আসে গাছ থেকে।

সূত্রঃ ইউনিভারসিটি অফ ম্যাসাচুসেটস অ্যাট অ্যামহার্স্ট প্রেস বিজ্ঞপ্তি ১৭.২.২০১৫

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

RNI Regn No. WBBEN/2000/1531 Date of Publication: March 1, 2015 Postal Regn No.KOL RMS/262/2013-15

অবাক পৃথিবী

● বাদুড়রা ক্ষেত খামারের পোকা মাকড় খেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-শিল্পে প্রায় ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার বাঁচিয়ে দেয় প্রতি বছর।

● নতুন ১৪ প্রজাতির নাচুনে ব্যাঙ আবিস্কৃত হয়েছে ২০১৪ সালে। এই নিয়ে পৃথিবীতে নাচুনে ব্যাঙের প্রজাতি হল মোট ২৪।

● আবহাওয়া যত উষ্ণতা বাড়ে তত বেশি পুরুষের তুলনায় জন্ম বেশি হয় মেয়ে কচ্ছপের।

● রেন ডিয়ারের চোখের মনি নীল হয়ে যায় শীতের সময়, যাতে তখন কম আলোতেও তাদের দেখতে অসুবিধা না হয় প্রকৃতি যেন সেই ব্যবস্থাই করে রেখেছে।

● হাঙররা বছরে ১০ কি তারও কম মানুষ মারে। কিন্তু মানুষ বছরে ১০ কোটিরও বেশি হাঙর হত্যা করে।

উত্তর বঙ্গে ফিরে এলো স্টেপি ঈগল

উত্তরবঙ্গের দুই বনে প্রায় ১৭ স্টেপি ঈগল দেখা গেছে। তাদের মাছ ধরতে দেখা গেছে জলদাপাড়ার কোদালবস্তির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া শিলতোর্ষা নদীতে। আবার বক্সার জঙ্গলে জয়ন্তীর মহাকাল পাহাড়েও তাদের দেখতে পাওয়া গেছে। মনে করা হচ্ছে প্রায় ২০ বছর পর তারা আবার ফিরে এসেছে ওই অঞ্চলে। এ কথা জানা গেছে 'জীবন-কথা' পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে।

এই ঈগল ভারতের পাখি নয়। তারা এখানে আসে শীতের সময় যখন তাদের নিজের দেশে তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের অনেক নীচে। তারা থাকে ইয়োরোপের রোমেনিয়া আর রাশিয়ায়। মধ্য এশিয়ার দেশগুলি আর মঙ্গোলিয়াতেও তারা বসবাস কারে। তারা পছন্দ করে খোলা, উন্মুক্ত ঘাসভূমি। শীত পড়লে ইয়োরোপ আর মধ্য এশিয়ার স্টেপি ঈগলরা চলে যায় আফ্রিকায়। আর যারা থাকে আরও পুবে, যেমন মোঙ্গোলিয়ায়, তারা আসে ভারতের তুলনামূলক উষ্ণতায়। এদের রঙ হয় খয়েরি। শকুনের মত এরাও মরা প্রাণীর মাংস খায়। তবে ইঁদুর, মাছ, ব্যাঙও এদের খাদ্য তালিকার মধ্যে পড়ে।

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট–হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

ক্যুইজ?!?!

১। চাঁদ বিষয়ে নীচের কোন তথ্যটি ঠিক নয়?
(ক) এক সময়ে পৃথিবীর অংশ ছিল, পাথরের আঘাতে আলাদা হয়ে যায় (খ) এর জন্য সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা হয় (গ) এর আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের গতিকে আস্তে করে দিয়েছিল বলে এখন ২৪ ঘন্টায় আমাদের একদিন, নইলে আট ঘন্টাতে হত (ঘ) চাঁদের এক দিক পুরোপুরি অন্ধকার

২। সিন্ধুরক্ষক কি?
(ক) ভারতীয় নৌবাহিনীর ডুবোজাহাজ যা ২০১৩ তে মুম্বাই ডকে নিজের টরপেডোর আঘাতে ডুবে গিয়েছিল (খ) ভারতীয় নৌবাহিনীর হিন্দি নাম (গ) সম্ভাব্য সুনামি প্রতিরোধ করার কর্মসূচির নাম (ঘ) সিন্ধুঘোটকের থেকে আকৃতিতে ছোট সমুদ্রের এক স্তন্যপায়ী প্রাণী

৩। কোন দেশে সব থেকে বেশি দুধ উৎপাদন হয়?
(ক) ভারত (খ) আমেরিকা (গ) নিউজিল্যান্ড (ঘ) অস্ট্রেলিয়া

৪। নীচের চার নেতা ও তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্মারকের নাম এর মধ্যে কোনটি বা কোনগুলি ঠিক নয়?
(ক) মহাত্মা গান্ধী-রাজঘাট (খ) ইন্দিরা গান্ধী-বিজয়ঘাট (গ) লালবাহাদুর শাস্ত্রী-শান্তিবন (ঘ) রাজীব গান্ধী-বীরভূমি

৫। ভারতের কোথায় মানুষের বাস করার সব থেকে প্রাচীন নির্দশন পাওয়া গেছে?
(ক) হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র (খ) মধ্য প্রদেশের ভীমবেটকা (গ) অন্ধ্রপ্রদেশের জওলাপুরম (ঘ) গুজরাটের লোথাল

৬। এদের মধ্যে কোনটি পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমি অধিকার করে আছে এবং প্রতিটি মহাদেশে দেখা যায়?
(ক) পর্বতমালা (খ) মালভূমি (গ) মরুভূমি (ঘ) মিষ্টি জলের হ্রদ

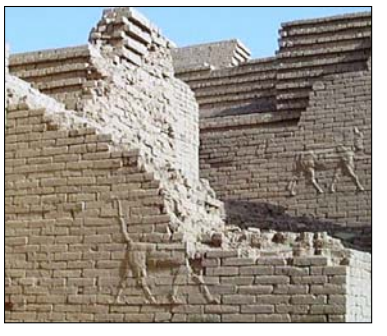

৭। ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ কোন দেশে দেখা যায়?
(ক) আফগানিস্তান (খ) জরডন (গ) ইরান (ঘ) ইরাক

৮। বিরাট কোহলি, সুনীল গাভাস্কার ও বিজয় হাজারে ছাড়া আর কোন ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে তাঁর প্রথম টেস্টে শতরান করেছিলেন?
(ক) দিলীপ বেঙ্গসরকার (খ) মহম্মদ আজাহারুদ্দীন (গ) অজিত ওয়াদেকার (ঘ) কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত

৯। সারা বিশ্বে প্রতিদিন গড়ে কত শিশু দূষিত জল এবং খারাপ নিকাশি ব্যবস্থা থেকে হওয়া পেটের অসুখে মারা যায়?
(ক) ১৪০ (খ) ১৪০০০ (গ) ১৪০০ (ঘ) ৫০০

১০। নেপালের জাতীয় পতাকার কী বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোনও দেশের পতাকার নেই?
(ক) এটি গোল (খ) চারের বেশি দিক বা কোন আছে (গ) পশুপতিনাথ এবং বুদ্ধদেবের ছবি আছে (ঘ) লাল কিম্বা নীল যে কোনও রঙের হতে পারে

উত্তর : ১/ঘ, সেদিকে তখন চাঁদের দিন কারণ সূর্যের আলো সেদিকে পড়ছে; ২/ক; ৩/ক; ৪/খ আর ঘ উল্টে পাল্টে গেছে; ৫/খ; ৬/খ; ৭/ঘ; ৮/ক; ৯/গ; ১০/খ।

স্বত্বাধিকারি মালবী গুপ্তর পক্ষে অনীশ গুপ্ত দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com